শুকুরবেক বেইশেনালিয়েভ
আজিজের রাখালি

আজিজ

রাখালের ছেলে আজিজ। শীতে গ্রীষ্মে সে থাকে উঁচু পাহাড়ে চারণভূমিতে, তাকে এরা বলে জাইলোও। আজিজের বাবা সারা দিন ভেড়া চরায়, আর ছাউনিতে মা বাবার জন্যে অপেক্ষা করে, রান্না করে, মেরামত করে পোষাক, সন্ধ্যায় ভেড়াগুলোকে খোঁয়াড়ে তুলতে সাহায্য করে।

শেষ ভেড়াটি খোঁয়াড়ে ঢুকল। বাপ এল ছাউনিতে, ছোট্ট আজিজকে তুলে সে লোফালুফি করলে।

মার কিন্তু ভারি ভয়। বলে:

'ঢের হয়েছে, একবার ফসকালেই বাস!'

'রাখালের ছেলে, সে হবে সাহসী শক্তসমর্থ,' হেসে ওঠে বাপ, 'একটু বড়ো হোক না, সত্যিকারের রাখালের মতো ঘোড়া ছোটাবে।'

হাত বাড়িয়ে মা ডাকে:

'আয় আজিজ, আমার কাছে।'

আজিজের কিন্তু বাপের সঙ্গই বেশি পছন্দ। কী বড়ো আর তাগড়াই তার বাপ, তার চাপকান-আলখাল্লা থেকে আসে ভেড়ার লোম আর ধুনির ধোঁয়ার গন্ধ।

এক দিন বাপ বললে:

‘আজ আজিজকে নিয়ে যাব আমার সঙ্গে চারণভূমিতে।’

ভয় পেয়ে গেল মা:

‘না, না, ও যে এখনো ভারি ছোটো।’

তর্ক বাধল, ঠিক হল যার কোলে আজিজ যাবে, সেই তাকে নেবে।

ছাউনির মাঝখানে বসানো হল আজিজকে। বাপ মা দু'দিকে ডাকল তাকে:

‘আয় আজিজ, আমার কাছে আয়!’

মায়ের দিকে চাইল আজিজ, হাত বাড়িয়ে সোহাগ করে চেয়ে আছে তার দিকে।

তারপর চাইল বাপের দিকে, হাতের চ্যাটালো তেলো নাড়ছে সে।

আর পারল না আজিজ, ছুটল বাপের দিকে।

‘তোকে ঘোড়ায় চড়া শেখাব, ভেড়া চরাবি,’ বললে বাপ।

ছাউনি থেকে বেরুল ওরা, ঘোড়ায় চেপে বসল বাপ, আজিজকে বসালে সামনে, তারপর খুশিতে কী সব বলাবলি ক'রে চলে গেল পালের দিকে।

ছাউনিতে রইল মা। অনেকক্ষণ সে তাকিয়ে দেখল ওদের, তারপর এক কলসী দুধ আর থলেতে রুটি নিয়ে চলল তাদের পেছন পেছন।

আজিজ হল রাখাল

চারণভূমিতে প্রথম আসার পর থেকেই আজিজের সবচেয়ে ভালো লাগল বাপের সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চেপে ভেড়া চরাতে।

যখন সে ছিল ছাউনিতে, মায়ের কাছে, তখন সে ভেড়া ছাড়া আর কিছু দেখে নি, আর এখন...

এখন বাপের আলখাল্লার তল থেকে পাখির ছানার মতো মাথা বাড়িয়ে সে বসে থাকে মস্ত এক ঘোড়ার পিঠের ওপর বিছানো মখমলী কম্বলের ওপর।

ঘোড়ায় সে দোলে যেন দোলনায়। তার মনে হয় সে যেন অনেক বেড়ে উঠেছে। যে পাহাড়গুলোকে দেখে আগে তার ভয় হত, এখন মনে হয় তারা যেন তেমন ভয়ংকর কিছু নয়, বরং কেমন যেন সুন্দর।

প্রথমবার পাহাড়ে গাছের পাতায় হাত দিয়ে সে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেছিল:

'গাছ! এই দ্যাখো, গাছ!'

'এটা হল ফার গাছ... এটা বার্চ... এটা জুনিপার... এটা বনগোলাপ,' গাছ আর ঝাড়গুলোর নাম বলেছিল বাবা।

'ফার, বার্চ, জুনিপার...' মুখস্থ করলে আজিজ।

আজিজের ইচ্ছে হল সবই সে চিনে নেবে, তবে চট করেই কি আর গাছে গাছে তফাৎ মনে রাখা যায়!

একবার একটা মোড় ঘুরতেই আজিজ দেখল পাহাড় থেকে জল পড়ছে, ভয়ংকর তার গর্জন, ফেনায় ফেনায় শাদা।

'জল! জল!' চেঁচিয়ে উঠল আজিজ।

বাপ ঘোড়া থামালে, আজিজের কোঁকড়া চুলে আদর করে হাত বুলিয়ে হেসে বললে:

'এটা জলপ্রপাত।'

অবাক হয়ে বাপের দিকে চাইল আজিজ।

‘জলপ্রপাত?’

‘হ্যাঁ,’ বললে বাপ, ‘জলপ্রপাত মানে জল পাহাড়ের উঁচু থেকে নিচে এসে পড়ছে, দেখছিস কেমন?’

‘জলপ্রপাত, জল-প্র-পাত,’ চেঁচাল আজিজ, তবে গলা ওর ডুবে গেল জলপ্রপাতের আওয়াজে।

রোজ বাপের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে পাহাড়ে যেত আজিজ, কিছু না কিছু নতুন সে দেখত রোজই।

বাপের জন্যে কান্না

বাপের সঙ্গে আজিজ যেদিন চলে যায়, সেদিন ভারি মন কেমন করেছিল মায়ের। তবে পরে সয়ে গেল।

এই ভেবে সে শান্ত হল, ‘সব ছেলেই মায়ের চেয়ে বাপকে বেশি ভালোবাসে।’

সন্ধেয় বাপ-ছেলে যখন ভেড়া চরিয়ে ফিরল, মা এগিয়ে গিয়ে ঘোড়া থেকে আজিজকে নামিয়ে তাকে নিয়ে এল ছাউনিতে। আজিজ তখন যেমন ক্লান্ত, তেমনি সুখী। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল সে, স্বপ্নে দেখল জলপ্রপাত, পাহাড়ের ওপর নীল নীল লম্বা ফার গাছ, দামড়া দামড়া ভেড়া।

একদিন মা ঠিক সময়ে জাগাল না আজিজকে, ছাউনিতেই রেখে দিলে তাকে। ঘুম ভেঙে কাঁদতে লাগল আজিজ, খুব ডাকাডাকি করলে বাপকে, তার কাছে পাহাড়ে যেতে চাইছিল সে।

আজিজের সামনে কত খাবার ধরে দিলে মা, কত গল্প শোনালে, আজিজ কিন্তু কেবলি ঝোঁক ধরলে:

‘বাবার কাছে যাব! বাবার কাছে যাব!’

সন্ধেয় বাপ না ফেরা পর্যন্ত শান্ত করা গেল না আজিজকে। এর পর থেকে মা রোজ ভোরে জাগিয়ে দিত ছেলেকে, বাপের সঙ্গে পাহাড়ে যাবার জন্যে গোছগাছ করে দিত।

'দ্যাখো, আমি বড়ো হয়ে গেছি!'

সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত বাপের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে বেড়ায় আজিজ, ভেড়া চরাতে সাহায্য করে।

খাওয়া-দাওয়া করে কাঠখড় পোড়ানো আগুনে, ঠিক যেন সত্যিকারের রাখাল, ঘুমোয় ফার গাছের তলে বিছানো মখমলী জাজিমে, মাথা রাখে ঘোড়ার পিঠ থেকে খসানো জিনে। অনেক নতুন বিদ্যে সে শিখে গেছে, জানে পাহাড়ে তৃণভূমির মধ্যে দিয়ে পথ করে নিতে, ব্যাঙের ছাতা, ফল, মূল কুড়তে। এমন কি মাথার ওপর চক্কর দেওয়া ঈগলপাখিগুলো দেখেও তার ভয় হত না।

একদিন বাপের সঙ্গে এক সবুজ টিলায় বসে ভেড়া চরা দেখছিল আজিজ। ছাঁদন-বাঁধা ঘোড়াটা ঘাস খাচ্ছিল। হঠাৎ লাফিয়ে উঠল বাপ:

'আরে, ভেড়াগুলো! ভেড়াগুলো যে চলে গেছে অনেক দূর!'

'আমি তাড়াব! আমি!' বলে ছুটে গেল আজিজ। ভাবল, 'বাবাকে দেখাব যে আমি ছোটো নই।'

ভেড়াগুলো কিন্তু খাদ বরাবর এগিয়েই চলল।

'হেই... হেই!' চেঁচাল আজিজ, ছুটে গেল পালের সবচেয়ে গোদা, ছেয়ে রঙের ভেড়াটার দিকে।

টিলার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলের কীর্তি দেখছিল বাপ। ভালোই লাগছিল যে ছেলে তাকে সাহায্য করছে।

বাকি ভেড়াগুলো পালের গোদার পেছু পেছুই চলল।

আজিজ হাঁক দিল গোদাটাকে। বাচ্চা ছেলেকে দেখে ভেড়াটা মাথা তুললে, কান নাড়ালে, তারপর যেন কিছুই এসে যায় না এই ভাব করে ঘাস ছিঁড়তে লাগল।

ভারি রাগ হল আজিজের। বার কয়েক চাপড় মেরে সে ভেড়াটার কান ধরে পেছু ফেরাতে চাইল। মাথা ঝামটা দিলে ভেড়াটা, ঘাসের ওপর উল্টে পড়ল আজিজ, তবে সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে উঠে আঁকড়ে ধরল ভেড়ার লোম। ছেয়ে ভেড়াটা এতক্ষণও চুপচাপ ছিল, হঠাৎ চমকে গিয়ে ছুটতে শুরু করল, ঘাসের ওপর ছেঁচড়াতে লাগল আজিজকে। আজিজ কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়, জোরে ভেড়ার গলা জড়িয়ে ধরল সে। তবে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে হাত খসে সে পড়ল ঘাসের ওপর।

ভেড়াটাও থামল, কয়েকবার মাথা ঘুরিয়ে হঠাৎ ধারালো খুরে চোট মারল আজিজকে। ভয়ানক রেগে আজিজের ইচ্ছে হয়েছিল ছুটে যাবে গোদাটার দিকে। কিন্তু পা তার আর নড়ল না, ঘুরে উঠল মাথা, ফের লুটিয়ে পড়ল সে।

দূর থেকে বাপ লক্ষ্য করছিল তাকে। এবার সে ভয় পেয়ে ছুটে এল। দেখল আজিজ লুটিয়ে পড়ে আছে, নড়ছে না, পায়ে তার রক্ত...

সযত্নে আজিজকে বাপ তুলে নিল তার দরাজ কলিজার কাছে।

আজিজের আরোগ্যলাভ

দিন কয়েক আজিজ বিছানায় শয্যাশায়ী। মা তার কাছ থেকে নড়ে না, এখন কেউ আর আজিজকে ডেকে নিয়ে যাবে না তার কাছ থেকে। সবচেয়ে রুচিকর খানা বানায় সে আজিজের জন্যে, আজ কুর্দাক, কাল মান্তি, পরশু আবার বেশবারমাক।*

কিন্তু আজিজের কিছুই ভালো লাগে না। বিরক্তি ধরে গেল বিছানায় পড়ে থাকতে। মন ছোটে তার চারণক্ষেতে, বাপের কাছে।

একদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখে, বাপ বসে আছে তার বিছানায়। আজিজ একটু উঠে বাপের আস্তিন ধরে চেঁচাল:

'আমি তোমার সঙ্গে যাব, নিয়ে চলো আমায়...'

'ঠিক আছে বেটা, ঠিক আছে,' হাসল বাপ, 'এক্ষুনি যাব। ওগো, সাজ করিয়ে দাও ছেলেকে।'

ঘোড়ায় চাপল বাপ, সামনে পাতলে তুলতুলে বালিশ, তার ওপর বসালে আজিজকে, রওনা দিলে... তবে চারণক্ষেতে নয়, একেবারেই অন্য দিকে।

'কোথায় যাচ্ছি বাবা?' জিজ্ঞেস করলে আজিজ।

'ডেরায় বেটা,' বললে বাপ, জোরে তাড়া দিলে ঘোড়াকে।

হয়ত তাজা হাওয়া, হয়ত বা জোর দৌড়, কে জানে কেন হঠাৎ ভারি খুশি লাগল আজিজের। জখমটা পর্যন্ত টাটাল না।

চলল ওরা অনেকক্ষণ। কেবলি ঢালু বেয়ে নামল নিচেতে। শেষ পর্যন্ত পেঁছল সায়রের তীরে, অনেক শাদা শাদা ছাউনি সেখানে। ঘোড়া থেকে নেমে বাপ আজিজকে কোলে নিলে, চলল একটা ছাউনির দিকে।

ছাউনিটা দেখা গেল একটা দোকান। এমন সব আশ্চর্য্য জিনিস সেখানে যে আজিজের চোখ চুলবুল করে উঠল।

দোকানে বসে আছে মোচওয়ালা এক চাচা, চোখ দুটো তার ভারি ভালো মানুষের মতো। লোক দেখে সে উঠে দাঁড়াল, মান্যি করে আদর জানালে। কী কয়েকটা কথা

---

* কুর্দাক — সেদ্ধ ভেড়ার মাংস; মান্তি — মাংসের দোলমা; বেশবারমাক — ভেড়ার মাংসের কিমা।

বললে বাপ, সেও মাথা নেড়ে আজিজের দিকে চোখ টিপে চলে গেল ভেতর দিকে কোথায়।

ফিরল দুই হাতে বাদামী পোষাক আর বাদামী জুতো নিয়ে।

'এই নিন বেকির-আকে,' বললে দোকানী, 'একেবারে আপনার সওয়ারীর মাপসই।'

আজিজের বুক ঢিপঢিপ করে উঠল। সে কি, এসব তারই জন্যে?

বাপ কিন্তু শান্ত ভাবে হাসল, পকেট থেকে টাকা বার করে কয়েকটা নোট এগিয়ে দিলে দোকানীর দিকে।

'তা এই দুষ্টুটার জন্যে কিছু মিষ্টিও মেপে দিন খানিক বেশি করে!'

আরেকবার আজিজের দিকে চোখ মটকালে দোকানী, তারপর ওজন করতে লাগল লজেন্স, বিস্কুট, হালুয়া। সবগুলোকে প্যাকেটে মুড়ে এগিয়ে দিলে বাপের দিকে।

দোকান থেকে বেরিয়ে তারা গেল পাশের ছাউনিতে।

এ জায়গাটা আজিজের আরো ভালো লাগল। এমন তকতকে পরিষ্কার ছাউনি সে আর কখনো দেখে নি। কী মিষ্টি গন্ধ!

তাদের দিকে এগিয়ে এল শাদা স্মক পরা একটি মেয়ে। আজিজ ভাবল, এও নিশ্চয় দোকানী, আরো কিছু কেনা হবে ভেবে আগেই সে খুশি হয়ে উঠল।

কিন্তু ব্যাপার ঘটল অন্যরকম। মেয়েটার সঙ্গে কী যেন ফিসফাস করলে বাপ, তারপর বললে:

'দেখি তো এবার আজিজ, নতুন পোষাকটা তোর কেমন মানাচ্ছে!'

মেয়েটা চটপট শাদা চাদর ঢাকা তক্তপোষে বসিয়ে দিলে আজিজকে, খুলতে লাগলে তার জুতো।

কেবল তখনই আজিজের খেয়াল হল মেয়েটা মোটেই দোকানী নয়, ডাক্তার।

বাপ যতক্ষণ তার পোষাক বদলাল, তার মধ্যেই সে তার জখম দেখে কী একটা ওষুধ মাখিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলে।

আজিজের খুবই লাগছিল, তাহলেও কাঁদলে না সে।

'তুই দেখছি সত্যিকারের সওয়ারী,' হাসলে মেয়েটা, 'নে, এবার দাঁড়া, ভয় নেই।'

মেয়েটা আজিজকে মেজের ওপর দাঁড় করিয়ে আস্তে ঠেলা দিলে।

আজিজ পড়তে পড়তেও কোনো রকমে দাঁড়িয়ে রইল, পা তার কাঁপছিল।

কিন্তু প্রথম পা'টা সে ফেললে, তারপর দ্বিতীয়... তৃতীয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে তার জখমের কথা প্রায় ভুলেই গেল।

স্মক পরা মেয়েটা তার বাপকে দিলে ওষুধ আর ব্যাণ্ডেজ, বিদায় দেবার সময় বললে:

'ব্যাণ্ডেজ বদলাতে হবে একেক দিন পরপর। শীগগিরই ভালো হয়ে যাবে।'

‘হার মানলি তো, গোদা!’

‘সবুর কর বেটা,’ আজিজকে বললে বাপ, ‘কিছুদিন যাক না, গোদাটাকে শায়েস্তা করা যাবে।’

আজিজের আর তর সইছিল না, অধীর হয়ে উঠেছিল সে। ইচ্ছে হচ্ছিল যত তাড়াতাড়ি গিয়ে গোদাটার ওপর প্রতিশোধ নেবে।

তারপর আজিজ যখন একেবারে ভালো হয়ে গেল, বাপ তখন একদিন বললে:

‘তৈরি হয়ে নে বেটা, গোদাটাকে শিক্ষা দেওয়া দরকার।’

দেয়াল থেকে চাবুকটা খসিয়ে আজিজ জিজ্ঞেস করলে:

‘চাবুক পেটা করব, না বাবা?’

বাপ ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লে:

‘মারব কেন? স্রেফ মনিবকে মান্যি করতে শেখাব। এমন বাধ্য হবে যে চেনা যাবে না। তবে দেখিস ঘাবড়াস না। আর যদি ভয় পাস তবে বরং এখনি বল।’

‘না, না, ভয় পাব কেন,’ বললে আজিজ, তবে আতঙ্কে ওর বুকে কিন্তু রীতিমতোই খিঁচ ধরেছিল।

ছাউনি থেকে ভেড়ার পালের কাছে গেল ওরা।

ছেয়ে রঙের গোদাটা ঘাস চিবুনো বন্ধ করে চেয়ে রইল আজিজের দিকে।

বাপ এগিয়ে গিয়ে ধরতে গেল ওটাকে। ভেড়াটা কিন্তু লাফিয়ে সরে গিয়ে ছুট লাগাল। অন্য ভেড়াগুলো ভয় পেয়ে খচমচিয়ে সরে গেল দূরে।

তাড়া করে গিয়ে বাপ গোদাটার পেছন পা চেপে ধরলে। তারপর লাফিয়ে উঠল তার পিঠে। বুনো ঘোড়ার মতো দাপাদাপি লাগাল ভেড়াটা, কখনো এদিক ছোটে, কখনো ওদিক, কখনো কদমে, কখনো দুলকিতে। কয়েকবার লাফালাফিও করলে। কিন্তু বাপকে কি আর উল্টে ফেলা যায়, বাপ যে পাকা সওয়ারী!

তাছাড়া ভেড়া তো আর ঘোড়া নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁপিয়ে গেল গোদাটা, ভীরুর মতো ছোটো ছোটো পা ফেলতে লাগল আস্তে করে। তখন আজিজের কাছে এসে বাপ তাকে নিজের পেছনে বসিয়ে বললে:

‘এইবার গোদাটাকে বশ মানিয়েছি। আর অবাধ্যতা করবে না। যেদিকে হাঁকাবি, সেই দিকেই যাবে।’

ভেড়ার নরম পিঠের ওপর আজিজ আয়েস করে বসে গোড়ালি দিয়ে তার পেটে গুঁতো মারলে।

‘সামনে গোদা, সামনে! কচ্যা, কচ্যা!’

দেখা গেল ঘোড়ার চেয়ে ভেড়ার পিঠে চেপে যাওয়া অনেক ভালো। পালটার মাঝখানে অনেকক্ষণ ভেড়া চেপে বেড়াল আজিজ, অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল অন্য ভেড়াগুলো।

শেষ পর্যন্ত থেমে গেল ভেড়াটা, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিল, হাঁপাচ্ছিল। লোমগুলো হয়ে উঠল ভেজা ভেজা, চকচকে যেন রুপো।

ভেড়া থেকে নেমে বাপ বললে আজিজকে:

‘এবার ও পুরোপুরি হার মেনেছে। যেমন খুশি চেপে বেড়াতে পারিস।’

সেইদিন থেকে ছেয়ে ভেড়াটা হল আজিজের নিজস্ব ‘ঘোড়া’। তাতে চেপেই সে যেত চারণমাঠে, ফিরতও ওটায় চেপেই।

ফুরিয়ে গেল গ্রীষ্মকাল। হেমন্তে সমস্ত ভেড়াকে নিয়ে আসা হল যৌথখামারে। সবশেষে ওজন করা হল ছেয়ে ভেড়াটাকে।

ওটাকে যখন নিয়ে যাওয়া হল, বাপের পেছন দিকে আড়াল নিয়ে কেঁদে ফেলল আজিজ, দোস্তকে ছেড়ে দিতে ভারি কষ্ট হচ্ছিল তার।

যৌথখামারের সভাপতি, ভেড়া খামারের ম্যানেজার, যে লোকগুলো ভেড়া ওজন করে নিচ্ছিল, সবাই তারা তার বাপের বড়ো বড়ো পুরুষ্টু ভেড়াগুলোর খুব তারিফ করলে।

দরাজ হেসে বাপ বললে:

‘তার অর্ধেক কৃতিত্ব এই ছোট্ট মানুষটির। বেরিয়ে আয় বেটা, লজ্জা করিস না।’

সভাপতি বোধ হয় টের পেয়েছিল যে ছেয়ে রঙের ভেড়াটার ওপর আজিজের টান বেশি। ছেলেটার কাছে এসে সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে।

‘বেকির-আকে, কালকেই তো আপনি এখান থেকে বাচ্চা নিয়ে যাবেন। নিজেই আজিজ তার কতকগুলোকে পালুক। ও যে আমাদের খাঁটি রাখাল!’

শিঙ-ওঠা ছানা

পরের দিন বাপ অন্যান্য পালগুলো ঘুরে প্রতি পাল থেকে কয়েক ডজন করে ভেড়ার ছানা বাছাই করে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে এল নিজের ছাউনিতে। তারপর আজিজকে বললে:

'এই দ্যাখ, এগুলোকে পালতে হবে রে বেটা। পরের বছরেই এগুলো বেশ দামড়া হয়ে উঠবে, আর আরো বছর দুয়েক পরে একেবারে কেঁদো। তুই নিজে কতকগুলো বেছে নে, ভালো করে দেখাশোনা করিস।'

আনন্দে আজিজ ছুটে গেল ছানাগুলোর দিকে, আঙুল দিয়ে দিয়ে গুণতে লাগল।

ভারি ছোটো ছোটো ছানাগুলো, ভারি ভীরু, নিরীহ। আজিজকে ঘিরে তারা ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকলে: 'ব্যা-ব্যা-অ্যা।'

ভারি মায়া হল আজিজের। চেঁচিয়ে বললে:

'তাড়াতাড়ি ছানাগুলো চারণমাঠে নিয়ে যাই! ক্ষিদে পেয়েছে ওদের!'

ছাউনি থেকে বেরিয়ে এল মা আর বাবা। সবাই মিলে তারা ছানাগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল গোষ্ঠে।

আগে আগে গেল সবচেয়ে বড়ো ছানাগুলো, বসন্তের গোড়াতেই যারা জন্মেছে। নিজেরাই ওরা এখন চরে খেতে পারে, সঙ্গে সঙ্গেই ধরতে পেরেছিল কোথায় ওরা যাচ্ছে।

তবে সদ্য দুধ-ছাড়া ছানাও ছিল অনেক ক'টা, ভারি দুবলা, রোগা-রোগা। থেকে থেকেই সেগুলো থেমে যাচ্ছিল, আর কেবলি ব্যা-ব্যা করছিল।

সবচেয়ে ছোটো ছোটো গোটা দশেক ছানাকে জুটিয়ে আজিজ বললে:

'এগুলোকে মাঠে নিয়ে যেতে হবে না। এখানেই আমি ওদের খাওয়াব।'

বাহবা দিলে বাপ:

'সাবাস বেটা, ঠিক বলেছিস! অন্যগুলোকে তোর মা আর আমি চরাব। আর সবচেয়ে ছোটোগুলোর দেখাশুনা করবি তুই একা। শুধু আজকের দিনটির জন্যে নয় কিন্তু, বরাবর। ঠিক আছে?'

সানন্দে মাথা নাড়লে আজিজ:

'ঠিক আছে। দেখব কে ভালো পালে, তুমি না আমি।'

সেদিন থেকে আজিজ তার ছানাগুলোকে ছেড়ে প্রায় কোথাও কখনো যেত না। চরাত তাদের ছাউনির কাছাকাছি।

বরফের মতো ধবল রঙের একটি ছানাকে আজিজের সবচেয়ে বেশি ভালো লেগে গেল। তার নাম দিলে সে ধবলী। সব ছানার মধ্যে এইটেই ছিল ভারি বুদ্ধিমন্ত

আর সোহাগী। আজিজ যেই ডাকত, 'ধবলী, ধবলী, আয় এদিকে!'— অমনি ছানাটা ছুটে যেত তার দিকে, আর তার পেছু পেছু গোটা দলটা।

দিনের পর দিন স্তেপে চরে ছানাগুলো, বড়ো হয়ে ওঠে, গায়ে মাংস লাগে। শুধু একটি ছানার বাড় নেই। ছাই-ছাই তার গায়ের রঙ, মাথায় ছোটো ছোটো পাকানো শিঙ। অন্য কোনো ছানার কিন্তু শিঙ ওঠে নি, শুধু এইটেই শিঙওয়ালা। হয়ত সেই জন্যেই ওটা অমন রোগা?..

ওটাকে নিয়ে কী করা যায় ভেবে পাচ্ছিল না আজিজ, তাই বাপকে শুধাল।

ছাউনিতে একটা বস্তা নিয়ে এল বাপ।

বললে, 'বস্তাটায় খুদ আছে, যেগুলো রুগ্ন, দুবলা, সেগুলোর জন্যে। তোর ছানাটাকে খাওয়াস।'

আজিজ তার টুপি ভর্তি করে খুদ নিয়ে গেল ছানাটার জন্যে। ওটা কিন্তু খেতেই চাইল না, রেগে শিঙ নাড়লে।

আজিজ তখন জোর করে তার শিঙ চেপে ধরে এক মুঠো খুদ ঢুকিয়ে দিলে তার মুখে।

আর সে খুদের স্বাদ পাওয়া মাত্রই ছানাটা নিজেই মুখ বাড়াল টুপিটার দিকে, তৃপ্তি করে চিবুতে লাগল।

সবটা না খাওয়া পর্যন্ত আজিজ দাঁড়িয়েই রইল ছানাটার কাছে।

তারপর ঝরণার কাছে গিয়ে আজিজ টুপি ভরে জল আনলে, এগিয়ে দিল শিঙওয়ালাটার কাছে:

'নে খা, আমার হাত থেকে দানাপানি খাওয়া শেখ।'

বাধ্যের মতো মাথা বাড়িয়ে জল খেতে লাগল ছানাটা।

'ধবলী, ধবলী, আয় এ দিকে,' শাদা ভেড়াটাকে ডাকলে আজিজ।

ভেড়াটা কিন্তু আজিজের কাছে এসে দাঁড়াল কেমন ধীর পায়ে।

নিশ্চয় ছেয়ে রঙের ছানাটার ওপর হিংসে হয়েছে ওর। ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে সেটা তখন রোদ পোয়াচ্ছিল। সন্দেহের চোখে ধবলী তাকে শুঁকে দেখল। তাই দেখে বাকিগুলোও শুঁকতে লাগল ছেয়ে ছানাটাকে।

'চলে যা এখান থেকে,' হাত দিয়ে তাড়া দিলে আজিজ, 'শিঙওয়ালাটা একটু জিরোক। সবে খাওয়া-দাওয়া সেরেছে।'

ছানাগুলো সরে গিয়ে চরতে লাগল দূরে।

কিছুদিনের মধ্যেই ছাই রঙের ছানাটা একেবারেই বন্ধ করে দিলে ঘাস খাওয়া। যখনই খায়, খুদ আর রুটি।

ভারি আনন্দ হল আজিজের। নিজের পেয়ারের ছানাটি নিয়ে সোহাগ আর তার ধরে না। সারা দিন খেলে তার সঙ্গে, ঢিঁস দিতে শেখায়।

বাড়তে লাগল ছানাটা, বাড়ে তার শিঙ দুটিও।

একদিন হল কী, পালটার কাছেই আজিজ শুয়ে আছে, হঠাৎ পেছন থেকে কী

একটা গোলমাল কানে এল। তাকিয়ে দেখে, শিঙওয়ালাটা একটা কালো ছানাকে তাড়া করেছে।

শিঙ ছিল না সেটার, শিঙওয়ালার সঙ্গে কি আর পারে। পেছতে লাগল। ভারি খুশি হয়ে উঠল আজিজ:

'সাবাস শিঙে, সাবাস! পালের মধ্যে তুই হবি সবচেয়ে তাগড়াই।'

অন্য ছানাটাকে ধরে সে দুটোকে মুখোমুখি দাঁড় করালে, ঢুঁসোঢুঁসি করুক।

শিঙেটাও চট করেই বুঝে গেল কী করতে হবে, এমন ঢিঁস মারলে যে ওটা ছিটকে চলে গেল।

একদিন বাপের চোখে পড়ল, বস্তা খালি। ছেলেকে বললে:

'শিঙেটাকে আর খুদ দিস না। এমনিতেই ও সবচেয়ে তাগড়াই, যেগুলোর অসুখ হবে, খুদ দরকার তাদের।'

মুখ ভার করলে আজিজ:

'চাই না তোমার খুদ। আমার নিজের খাবার আমি ওকে দেব।'

কথাটা বাপের ভালো লাগে নি, তবে কোনো কথা বললে না।

সেই থেকে শিঙেটার ভারি সাহস বেড়ে গেল। কোনো ছানাকে দেখলেই ঢিঁসতে যেত। সবগুলোকে হারিয়ে দিত সে। একদিন হামলা করলে ধবলীর ওপর।

ধবলী লড়তে চাইল না, শুধু তাকাল আজিজের দিকে, যেন তার সাহায্য চাইছিল। আজিজ কিন্তু শিঙেটার পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিচ্ছিল। তা দেখে ধবলী চলে গেল চারণমাঠে, বাপের ভেড়াগুলোর কাছে। আজিজের পালে আর ফেরে নি।

শীত নাগাদ শিঙেটাই হয়ে উঠল পালের মধ্যে সবচেয়ে দামাল আর তাগড়াই। এমন কি কুকুর দেখে তেড়ে যেতেও তার ভয় হত না।

শিঙের শিঙ গেল

একদিন শিঙেকে নিয়ে আজিজ গেল তাদের পাশের একটা পালে। সেখানে দেখা হল তার দোস্ত সুলতানের সঙ্গে।

'শিঙওয়ালা ছানা আছে তোর? তাহলে ঢুঁসোঢুঁসি করুক আমারটার সঙ্গে,' নিজের ভেড়াটার শিঙ ধরে বড়াই করে বললে আজিজ।

কী ভেবে মাথা নাড়লে সুলতান।

'তোকেও ঢিঁসিয়ে দেবে, দেখবি?'

'তাগদ থাকলে দেখা!' বললে সুলতান।

'পরে কিন্তু কাঁদিস না,' ছানাটাকে সুলতানের দিকে মুখ করিয়ে চেঁচিয়ে উঠল আজিজ, 'লাগা, শিঙে, লাগা!'

ছানাটা ঝট করে কিছুটা পেছিয়ে গিয়ে জোরে এসে ঢুঁ মারলে সুলতানকে। বরফের ওপর উল্টে পড়ে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল সুলতান:

'হয়েছে, থামা, থামা!'

ছানাটাকে সরিয়ে এনে ঠেস দিয়ে জিজ্ঞেস করলে আজিজ:

'কী, এবার বিশ্বাস হল তো?!'

'হয়েছে,' বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে বললে সুলতান, 'কাল তোর শিঙেকে নিয়ে আসিস। আমি ওর একটা জুড়ি জোটাব। লড়িয়ে দেব দুটোকে।'

পরের দিন সকালে বাপ তার পাল নিয়ে গোষ্ঠে চলে যাবার পর আজিজ তার শিঙেকে নিয়ে এল সুলতানের কাছে।

আজিজকে একটু দাঁড়াতে বললে সুলতান, তারপর খোঁয়াড়ে ঢুকে সেখান থেকে তাড়িয়ে আনল মস্ত এক শাদা রঙের ধেড়েকে, মাথায় তার পাকানো পাকানো মোটা শিঙ।

তাকে দেখে মাথা নাড়লে আজিজ:

'উঁহুঁ, এ চলবে না। ওটা যে ধেড়ে, আর এটা ছানা।'

সুলতান তার কাছে ছুটে এসে তার হাত ধরলে:

'ভয় নেই রে, ভয় নেই! ওটা ঢুঁসতে পারে না, একেবারে বুড়ো!'

আর সত্যিই যেন তাই, ভেড়াটা ধীরে ধীরে সরে গেল, লড়তে চাইছিল না।

'সত্যিই তো,' ভাবলে আজিজ, 'আমার শিঙেটার সঙ্গে কেউ পারে নি। আর এই বুড়ো ধেড়েটার সঙ্গে কি আর ও পারবে না!'

ছানাটাকে ছেড়ে দিয়ে সে চ্যাঁচাল:

'লাগা, শিঙে, লাগা, দে ঢুঁস!'

ছুটে গিয়ে শিঙেটা শাদা ভেড়াটার পেটে গুঁতো মারলে বার কয়েক।

প্রথমটা তা গ্রাহ্যি করলে না ভেড়াটা। তারপর রেগে গিয়ে হিংস্র লাল চোখে তার বড়ো বড়ো শিঙ দুটো বাগিয়ে রইল।

পিছিয়ে এল ছানাটা, তারপর লাফিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে ঢুঁ মারলে ভেড়াটার বাগিয়ে-ধরা শিঙে।

সঙ্গে সঙ্গেই ছানাটার ছোটো একটা শিঙ বড়ো ভেড়াটার পাকানো শিঙে আটকে গেল। দু'পক্ষই ছাড়াবার অনেক চেষ্টা করলেও ফল হল না।

এইবার বড়ো ভেড়াটা গেল প্রচণ্ড ক্ষেপে। ছেলে দুটো সাহায্যের জন্যে ছুটে আসার আগেই সে শিঙেটাকে শূন্যে তুলে বার দুই তিন বেদম ঝাঁকুনি দিলে। মট করে শব্দ উঠল, ছিটকে গিয়ে পড়ল ছানাটা।

ছুটে গেল আজিজ, দেখে রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে ছানাটা, শিঙ দুটি তার আর নেই।

কেঁদে ফেললে আজিজ, শাদা খেড়ে আর তার মালিককে গালাগালি দিলে, কিন্তু তাতে আর কী হবে?!

জখম ছানাটাকে কোলে করে আনল বাড়িতে।

তারপর কাঁদতে কাঁদতে যখন বাপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বাপ বললে:

'তোরই দোষ বেটা। ভেড়ার ছানাকে অত লাই দিতে নেই। তাতে আবার ঢিঁসোঢিঁসি শিখিয়েছিস ওকে। তোকেও যে ঢিঁসিয়ে ঘায়েল করে দিতে পারত। তবে কাঁদিস না। তোর আদুরের শিঙ গেছে, সে বরং ভালোই হয়েছে। একটু শান্ত হয়ে চলবে।'

ছাউনি থেকে বেরিয়ে এল মা, ছানাটাকে নিয়ে বললে, কাল তাকে তাদের পালের সঙ্গে নিয়ে যাবে।

'ওখানে সে ভালো হয়ে উঠবে তাড়াতাড়ি। তবে ঢিঁস আর কখনো মারবে না।'

ছেলের কাছে এসে বাপ তার কাঁধে হাত রাখলে:

'এবার কাজে লাগতে হয় বেটা। আজ আমাদের পালটাকে নিয়ে যাব আরেকটা চারণমাঠে। তোর ছানাগুলো পারবে?'

'পারবে,' বললে আজিজ, 'এবার থেকে আমি ওদের ঠিকমতো দেখাশোনা করব।'

কিশোর পাঠকদের প্রতি

আদরের ছেলেমেয়েরা!

ছেলেদের জন্যে এ বইটি লিখেছেন নামকরা সোভিয়েত লেখক শুকুরবেক বেইশেনালিয়েভ। জাতিতে তিনি কিরগিজ। থাকেন সোভিয়েত দেশের একটি অঙ্গ-প্রজাতন্ত্র কিরগিজিয়ায়। নিজেদের ভাষায় ও দেশটা নিয়ে ছোটো বড়ো সকলের জন্যেই গল্প উপন্যাস লিখেছেন কম নয়।

বইটা কি তোমাদের ভালো লাগে?

কেমন লাগল তা যদি তোমরা কিংবা তোমাদের মা-বাবারা আমাদের লিখে জানান তাহলে প্রকাশালয় বাধিত হবে।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন
Progress Publishers 21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

ছবি এঁকেছেন ল. ইলিনা

ШУКУРБЕК БЕЙШЕНАЛИЕВ
РОГАТЫЙ ЯГНЕНОК
На языке бенгали

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

Б $\frac{70802-045}{014(01)-74}$ 597-74

শুকুরবেক বেইশেনালিয়েভ
আজিজের
রাখালি